International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-V, Issue-III, May 2019, Page No. 01-12
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v5.i3.2019.1-12

রাঢ়-বঙ্গের জেলা মুর্শিদাবাদ

ড. সুপম মুখার্জি
বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, সুভাষচন্দ্র বোস সেন্টিনারি কলেজ, মুর্শিদাবাদ

Abstract

It was thought that the name 'Murshidabad' was officially used in 1705.Though no such evidence was found in support of this theory.A book by Dr. Saktinath Jha in which he stated that Murshidabad was known by a renowned businessman Madhusudhan Das.Later Murshid Kuli, the representative emperor of the Mughals effaced former name and and renamed it after him.

Antiquity of a place is to be found from its ideal base of settlement and also from the changes it had gone through in the course of time.

Current boundary of Murshidabad is not formed on geographical boundary.So it is neither possible nor logical to proceed with our discussion regarding this border.Murshidabad is totally divided on the basis of administration.

Modern Murshidabad is intersected by Bhagirathi river in two parts.These two shores are named as-Bagdi and Rar.Interesting fact about these bifurcated land is that culture, topology and even agriculture have diversity between them till date.

There are lots of controversies relating to the origin of this land its name Murshidabad.

Also lots of documents could be found of the land Murshidabad and its two bifurcated banks.From these dogmas we can also know about the 28th tirthankar Mahavira, emperor Ashoka, Sasanka and their preachings and empires respectively.

Keywords: Geographical boundary, ancient history, rar, barendri.

মনে করা হয়, মুর্শিদাবাদ নামটি ১৭০৫ সাল থেকেই সরকারী ভাবে চালু হয় (District Census Hand Book, 1961, Introduction, pp.3)। যদিও এ নামের জন্ম কিভাবে হয়েছিল তার কোন প্রামাণ্য দলিল নেই। 'মুর্শিদাবাদের ৩০০ পালন কতদূর সঙ্গত?'শিরোনামে ডঃ শক্তিনাথ ঝাঁ লিখেছেন যে জনৈক ব্যবসায়ী সতিনাবী পুণ্যশ্লোক সমন্বয়ী সাধক মুখসূদন দাসের নামে আলোচ্য এলাকাটি পরিচিত ছিল। মোঘলদের প্রতিনিধি শাসক মুর্শিদকুলি প্রাক্তন নাম মুছে নিজের নাম স্থাপন করেছিলেন। তার আগমনের অনেক আগেই টাকশাল, বাণিজ্য কেন্দ্র এক সমৃদ্ধ জনপদের অস্তিত্বকে প্রমাণ করে। প্রাচীন এ ভূখণ্ডে, গঙ্গা-পদ্মার বিভাজনের মুখে বহু আগে গড়ে উঠেছিল কর্ণসুবর্ণ, কিরীটেশ্বরী, মহীপাল, শক্তিপুর প্রভৃতি সমৃদ্ধ নগর। নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ চাকলা অল্প বিস্তার লাভ করে। ইংরেজ আমলে নানা পরিবর্তণান্তে গঠিত হয় মুর্শিদাবাদ জেলা। অন্যদিকে মুর্শিদকুলি খাঁর নামের থেকেই নাকি মুর্শিদাবাদ নামের উৎপত্তি বলেও মনে করা হয়। আমিন-উস-সানের সাথে বিরোধের পর

ঔরঙ্গজেবের নির্দেশে বিশ্বস্ত অনুচর করতলব খাঁ মুর্শিদাবাদে প্রাসাদ নির্মাণ করেন এবং প্রভূত পরিমাণ অর্থ দিল্লিতে পাঠান। মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব খুশি হয়ে তার নাম দেন মুর্শিদকুলী (কথিত আছে তিনি নাকি ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে তা স্থানীয় প্রজাদের শ্রদ্ধা লাভের জন্য প্রচার কিনা তা সন্দেহাতীত নয় এবং তার নামানুসারেই এই অঞ্চলের নাম হয় মুর্শিদাবাদ। যদিও মুখসুসাবাদ, মুখসুদাবাদ, মাসুমাবাজার প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়।

অতি সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলার ৩০০ বছর উদযাপিত হয়েছে। কাজেই 'মুর্শিদাবাদ' জেলার প্রাচীন ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তা মাত্র ৩০০ বছরের ইতিহাস মূলত ১৭০৪ সাল থেকে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন একটি স্থানের নামের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তার প্রাচীনত্ব নিয়ে আলোচনা এই রচনার উদ্দেশ্য নয়। কেননা ভূ-প্রাকৃতিক এবং রাজনৈতিক কারণে স্থানের সীমা ও নামকরণ বদল নতুন কোন বিষয় নয়। ফলে কোন স্থানের বর্তমান মানচিত্র অনুসারে সেই আলোচনাও সম্ভব নয়। আসলে একটি স্থানের প্রাচীনত্ব তার বসতি স্থাপনের উপযুক্ত ভূমি এবং তারপর কালের নিয়মের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে খুঁজে নিতে হয়। যে কারণে 'বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব'তে- ডঃ নিহার রঞ্জন রায় বলেছেন, কোনও স্থান বা দেশের রাষ্ট্রীয় সীমা এবং উহার ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমা সর্বত্র সকল সময় এক নাও হইতে পরে। রাষ্ট্রীয় সীমা পরিবর্তনশীল; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রসার ও সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে কিংবা অন্য কোন কারণে রাষ্ট্রসীমা প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতে পারে, প্রায়শ হইয়াও থাকে- যেমন নদ-নদী, পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র ইত্যাদি কখনও কখনও রাষ্ট্রসীমা নির্ধারণ করে সন্দেহ নাই, প্রাচীন ইতিহাসে তাহাই ছিল সাধারণ নিয়ম। [১]

বর্তমানে মুর্শিদাবাদের যে সীমা তা যেহেতু কোন ভৌগোলিক সীমা দ্বারা গঠিত নয়- তাই প্রাচীন কালের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এই নির্দিষ্ট সীমা ধরে এগোনোও সঙ্গত নয় ও সম্ভবও নয়। কেননা ইতিহাস একটি অঞ্চলের বিশেষত্ব নির্ভর হওয়ায় সেখানে রাজনৈতিক বিভাজন উপর থেকে কিছু বিধিনিষেধ আরোপ করলেও কৃষ্টি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামগ্রিক আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকেই তুলে ধরে। মুর্শিদাবাদ-নদীয়া, বীরভূম-মালদা প্রভৃতি সন্নিহিত জেলার সাথে ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য আলাদা নয়। তা নিতান্তই প্রশাসনিক এবং পরবর্তী কালে মানব সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করলেও জীবন-জীবীকার ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত পরিবেশে তার কোন ছেদ রাজনৈতিক ভাবে বিভাজিত সময়ে পড়ে না। যদিও অনেক সময় প্রাকৃতিক অবদান ভেবেও সীমা নির্ধারিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলা কিন্তু একেবারেই প্রশাসনিক প্রয়োজন ভিত্তিক বিভাজিত। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের -২৩°-৪৩'° উত্তর থেকে ২৪°-৫২° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৭°৪৯ পূর্ব থেকে ৮৮°৪৪' দ্রাঘিমাংশে এই জেলার অবস্থান। ২০৯৫ বর্গমাইল এর এই জেলায়- উত্তর ও উত্তর পূর্বে গঙ্গা বা পদ্মানদী দক্ষিণে নদীয়া ও বর্ধমান জেলা, দক্ষিণ পূর্বের সামান্য অংশে জলঙ্গী নদী এবং পশ্চিম দিকে বীরভূম ও বিহারের সাঁওতাল পরগণা। বর্তমানের এই সীমানাতে উত্তর ও উত্তর পূর্ব দিকে যথাক্রমে গঙ্গা ও জঙ্গলী নদী থাকলেও তা পূর্বে একই স্থান দিয়ে একই আকারে প্রভাবিত ছিল না। সুতরাং প্রাকৃতিক সীমা দু-দিকে থাকলেও তা প্রাচীন মুর্শিদাবাদের ক্ষেত্রে সীমা নির্দেশের শেষ কথা বলা যায় না।

বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলা ভাগীরথী নদী দ্বারা প্রায় সমান দুটি ভাগে বিভক্ত। যদিও নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে এবং পূর্ব থেকে তার কোন অংশ যেমন পশ্চিম দিকে সরে গেছে, তেমনি আবার অনেক অংশ পশ্চিমের থেকে পূর্বে সরে এসেছে। ভাগীরথীর জন্য এই দুটি পাড়ের নাম হয়েছে বাগড়ি ও রাঢ়, পূর্ব তীর বাগড়ি ও পশ্চিম তীর রাঢ়। মজার বিষয় হল এই উভয় অংশের ভাষা সংস্কৃতি এমনকি ভূ-প্রকৃতির কৃষি ক্ষেত্রেও পার্থক্য বর্তমান। এই সময় অনেকটা ঘটি-বাঙ্গাল লড়ায়ের মত অবস্থা ছিল। যোগাযোগের কারণে পার্থক্য অনেকটা কমেছে, তথাপি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রেও অনেকেই এখনও এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তবে ভাগীরথী এভাবে ভাগ করলেও পূর্বের বাগড়ী অঞ্চল যেমন নদীয়া ও বর্তমান বাংলাদেশের সাথে সংযুক্ত তেমনি আবার পশ্চিম অংশ অর্থাৎ রাঢ় যুক্ত আছে বীরভূম-বাকুড়া-বর্ধমান প্রভৃতি জেলাঞ্চলের সাথে। ১৫ ও ১৬ শতকে মুল স্রোত যখন থকে

পদ্মার খাত দিয়ে বইতে থাকে তখন থেকেই ভাগীরথী ক্রমাগত ক্ষীণ হতে থাকে এবং রাঢ় ও বাগড়ি অনেকটা নিকটবর্তী হতে থাকে। আর এরই পরিণতিতে উভয় পাড় কাছাকাছি এসে সংযুক্ত হয়ে এই জেলায় পরিণত হয়।

এই জেলার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে ভূবিজ্ঞানী-গন যে সমস্ত তথ্য দিয়েছেন তা হল এই যে প্রায় ১৩ কোটি বৎসর অর্থাৎ ক্রিটেসাস যুগেই জলঙ্গী অঞ্চলের উদ্ভব ঘটেছিল। যদিও ভূ-বিজ্ঞানীদের অভিমত হল যে, মায়োসিন অর্থাৎ আনুঃ ৩ কোটি বৎসর পূর্বে মুর্শিদাবাদের জন্ম হয়েছিল এবং আনুঃ ১ থেকে ১.৫ কোটি বৎসর পূর্ব থেকেই এই ভূমি জেগে উঠতে থাকে। অন্যদিকে সমুদ্র সরে যাওয়ার ফলে রাজমহল পাহাড় থেকে গুনামি, বাশলই, পাগলা, দ্বারকা, ব্রাহ্মণী, ময়ূরাক্ষী অজয় এর মত নদীগুলি নেমে আসে। ফলে পরবর্তী কালে কৃষি আবিষ্কারের সাথে সাথে এই অঞ্চল সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে থাকে।

এ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদের যে সমস্ত প্রত্ন-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল কাটার সময়ে গঙ্গা ও গুমানি নদীর সংযোগ স্থলে প্রাপ্ত মৃত্তিকা নির্মিত সামগ্রী। যা মূলত তাম্রশ্মীয় যুগের পরিচয় বহন করে। প্রত্ন-বিশেষজ্ঞদের মতে আনুঃ ২০০০ খ্রিষ্ট-পূর্বাব্দ থেকে পঞ্চম খ্রীঃপূর্বাব্দ পর্যন্ত এই সভ্যতার সময় কাল। অর্থাৎ আর্য সভ্যতা বিকাশের পূর্বেই এখনে একটি সভ্যতা ছিল। যে কারণে পুরাতত্ত্ববিদ তথা প্রত্নতত্ত্ববিদ পরেশ্চন্দ্র দাশগুপ্ত-এর বর্ণনা অনুসারে ক্রিট ও প্রাচীন গ্রীস সভ্যতার সমসাময়িক বলেই মনে করা হয়। অন্যদিকে অজয়-নদীর তীরে আবিষ্কৃত পাণ্ডুরাজার ও সুরথ রাজার যে ঢিবি আবিষ্কৃত হয়েছে তা প্রায় হরপ্পা সভ্যতার সমসাময়িক বলেই মনে করা হয়। বর্তমান বীরভূম জেলা একেবারে মুর্শিদাবাদের সাথে সংযুক্ত জেলা-সুতরাং উক্ত সভ্যতার বিস্তৃতি যে মুর্শিদাবাদ জেলাতেও ছিল তা বলা যেতেই পারে। [২]

মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির হাটপাড়াতে প্রাপ্ত বহু পাথরের হাতিয়ার, এমনকি সামুদ্রিক মাছের কাটা-সমুদ্র ব্যবসায়ী আদি মুর্শিদাবাদ বাসীকে খুঁজে পেতে সাহায্য করে। মুর্শিদাবাদের প্রাচীন অধিবাসী অর্থাৎ আর্য-পূর্ব যুগে নিষাদ, অষ্ট্রিক, কোল-মুন্ডা প্রভৃতি জাতি যে ব্যবসা বাণিজ্যে অনেক এগিয়ে ছিল তার ওপর প্রমাণ হল ১৮৩৪ সালে মালয়েশিয়াতে আবিষ্কৃত শিলালিপিটি। যেখান থেকে রক্তমৃত্তিকাবাসী জনৈক মহা-নাবিক বুধগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। প্রথম দিকে এই স্থান নির্ণয় নিয়ে মতভেদ থাকলেও বর্তমানে সকলেই একমত যে, ভারতীয় নাম ও মঙ্গলসূচক এই লিপিটিতে বর্তমান মুর্শিদাবাদের 'রাঙামাটি' কেই বোঝান হয়েছিল। যে কারণে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় ১৯৮০ সালের তৃতীয় সংস্করণ এ লিখেছেন-"তখন মনে হয়েছিল চট্টগ্রামের রাঙামাটি (তার অর্থ রক্তমৃত্তিকা) মালয়ের কাছাকাছি;সুতরাং রক্তমৃত্তিকা রাঙামাটি হবার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু আমার এ অনুমান ভুল। এখন আর সন্দেহ করাবার কারণ নেই যে, মহা-নাবিক বুধগুপ্ত লিপি কথিত 'লো-তৌ-মো চিহতে' ছিল একটি বৌদ্ধ বিহার। য়ুয়াঙ চোয়াঙ-এ একই কথা বলেছেন। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে মহা-নাবিক বুধগুপ্ত তদানীন্তন গঙ্গা-ভাগীরথী সমীপবর্তী, কর্নসবর্নান্তগত রক্তমৃত্তিকা মহা বিহারের ভিক্ষু সংঘের আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে, সমৃদ্ধির সন্ধানে অন্য কোন স্থানের অন্য কোন মহাবিহার থেকে নয়। য়ুখান চোয়াঙের বিবরণ যে কত বাস্তবানুগ এই, আবিষ্কার তার অন্যতম প্রমাণ। [৩] প্রত্নতত্ত্ববিদ সুধীর রঞ্জন দাসের নেতৃত্বে বহরমপুর থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চিরুটি গ্রাম ও রেল স্টেশনের কাছে রাজবাড়ি ভাঙ্গায় খনন কার্যের ফলে, খ্রীঃ দ্বিতীয় শতক থেকে আনুঃ নবম শতক পর্যন্ত সময় কালের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মূলত শশাঙ্কের আমলে কর্ণসুবর্ণের খ্যাতির কথা শোনা গেলেও প্রায় ৭০০-৯০০মাইল বিস্তৃত এই অঞ্চল। হিউয়েন সাং ৬৩৭/৩৭৮ খ্রীঃ এখানে পরিভ্রমণে আসেন, তার বর্ণনা অনুসারে অশোক এখানে চারটি বৌদ্ধ স্তূপ নির্মাণ করেন। সুতরাং এই অঞ্চলের ইতিহাস প্রায় ২৫০০ বৎসরের পুরনো ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিশিষ্ট গবেষক বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে "সম্প্রতি কর্ণসুবর্ণের ভীমকি তলায়"একটি স্তূপ জাতীয় ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। এখানে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর খণ্ডের খোদিত মূর্তির সঙ্গে অশোকের মূর্তির সাদৃশ্য আছে বলে বিশেষজ্ঞগন মনে করছেন। [৪]

অন্য দিকে এ পর্যন্ত যে, প্রত্ন সামগ্রী পাওয়া গেছে তার প্রাচীনত্ব বিচার করে বলা হয় যে, দু পায়ে ভর দিয়ে প্রথম চলতে শেখা মানুষ "রামপেথিকাস" হল এ দেশের প্রকৃত পূর্ব পুরুষ, যেমন-আফ্রিকার ক্ষেত্রে এই গৌরব "কেনিয়াপেথিকাসের"। 'ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস' গ্রন্থেই দিলীপকুমার চক্রবর্তী এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ভারতের মূলত 'নিম্ন প্লাইসটো্সিন' যুগের নিদর্শন এখন পর্যন্ত পাওয়া গেছে, যা থেকে বলা যায় যে, মোটামুটি ২০ লক্ষ বৎসর পূর্ববর্তী সময় কালে। কিন্তু রামপেমিকাস থেকে 'হোমোসোপিয়েন্স' আসে। অধ্যাপক দীলিপ চক্রবর্তী তার ভারতবর্ষের প্রাগৈতিহাস গ্রন্থে আজকের মানুষের উদ্ভব কাল ধরেছেন মাত্র ১ লক্ষ বৎসর। তিনি আবার জাভা ও চিনের মানব অবশেষের বয়স যথাক্রমে ৭০, ০০০ লক্ষ বৎসর এবং ৪২০, ০০০ নির্ণয় করেছেন। যেখানে ভারতবর্ষের হরপ্পা সভ্যতার শোয়ান অববাহিকার প্রাপ্ত পাথরের অস্ত্র। [(প্রস্তরায়ুধ) = প্রস্তর (পাঁথর) আয়ুধ (অস্ত্র)] এর বয়স ধারা হয়েছে ২০ লক্ষ বৎসরের কাছাকাছি। কিন্তু মুর্শিদাবাদ-বীরভূম অঞ্চলের স্থায়ী ভাষা সহ প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে প্রত্নতত্ববিদগন আদি অস্ট্রিক নিষাদ এবং কোলদের এ অঞ্চলে প্রথম জনগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যাদের আমরা নব্য প্রস্তর যুগের সূচনা পর্বের মানুষ বলে ধরতে পারি। কেন না চাষাবাদ ও পশু শিকার-মাছধরা এসব ছিল তাদের জীবিকা। যদিও এ ঘটনা ২০-২৫ হাজার বৎসর পূর্বের বলে মনে করা হয়। [৫]

জেলার প্রাচীনতম আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি ভিত্তি এখানে সমুদ্র সরে আসার পর রাজমহল পাহাড় থেকে নেমে আসা একাধিক নদী এই অঞ্চলে কৃষি ও বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করে। যে কারণে পরবর্তী সময়ে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষও বসবাস শুরু করে। মুর্শিদাবাদের ফারাক্কা নিকটে আনুমানিক ২০০০ খ্রীঃ পূঃ 'কাজঙ্গল নগরী' নামে যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল রয়েছে তা দ্রাবিড় এবং অস্ট্রিক মানব গোষ্ঠীর সৃষ্ট বলে মনে করা হয়। সুতরাং এই সংস্কৃতি হরাপ্পার শেষ লগ্নের সমসাময়িক নিঃসন্দেহে বলা যায়। এখানে ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল খনন কালে গঙ্গা ও গুমানি নদীর স্থলে তাম্রাশ্মীয় মৃৎপাত্র ও বিভিন্ন ধরনের মূর্তি পাওয়া গেছে। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ তথা পুরাতত্ত্ববিদ পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত- মতে এগুলি প্রাক মোর্য যুগের হলেও এটি প্রাক আর্য যুগের সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এই আদিম সত্য জনগোষ্ঠীর ক্রীট ও গ্রীসের বাণিজ্যিক যোগাযোগও বর্তমান ছিল-এমন কথাও বলা হয়ে থাকে। [৬]

যাইহোক এখানে মূলত: চারটি স্তরে মনুষ্য বসতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রথম স্তরে মাটির চাক বসানো কুয়ো ও কিছু আদিম পোড়া মাটির নারী মূর্তি পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় স্তরে কতগুলি বাদামী রং-এর মৃৎপাত্র। তৃতীয় স্তরে মৌর্য আমলের ১৬ টি মুদ্রা সহ উত্তর ভারতীয় শৈলীর কাল রং-এর মৃৎপাত্র এবং চতুর্থ স্তরে পাওয়া গেছে কুষান ও গুপ্ত আমলের কিছু নিদর্শন। সুতরাং এর স্থায়িত্ব প্রায় ৫০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। সেখানে যদিও পৌরাণিক কাহানী এবং অতিসম্প্রতি বিশিষ্ট গবেষক দেবব্রত মালাকারের বেদের উদ্ভব স্থল গৌড় বরেন্দ্রী গ্রন্থটি কোন ভাবেই এই মত সমর্থন করে না। পুরাণ মহাভারত ও রামায়ণ সহ বৈদিক গ্রন্থাদি এবং কালিদাস এর জন্মস্থান সম্পর্কিত নিবন্ধে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, আর্যদের আদি নিবাস বৃহত্তর গৌড়দেশ। 'হরিরামপুর', 'পতিরাম', প্রকৃতি নাম করন ও 'গুড়' থেকে 'গৌড়'-'আর্য' থেকে 'ইক্ষাকু'-এমনকি সোমরস-অর্থাৎ গুড় থেকে প্রস্তুত মাদক জাতীয় পানীয় সহ নানা আঙ্গিকে বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে জানতে হলে বেদের উদ্ভব স্থল গৌড় বরেন্দ্রী-দেবব্রত মালাকার প্রকাশিত সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার গ্রন্থটি দ্রষ্টব্য। কোন কোন গবেষক আবার অতি উৎসাহী হয়ে খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকে এখানে আর্য আগমনের কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে এই সময় দক্ষিণ ভারতেও লৌহের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। এবং কজঙ্গল অঞ্চলে লৌহ নির্মিত বস্তুর সন্ধান কেন পাওয়া যাই নি-কেনই বা তা তাম্র প্রস্তর যুগে থেকে গেল। সে উত্তর পাওয়া যায় না।

অন্যদিকে ১৯৬২-৬৩ সালে ফারাক্কা ফিডার ক্যানেল এর থেকে বা তারও উত্তর অংশ থেকে ভাগীরথী, অজয় প্রভৃতি নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বর্ধমান জেলার পাণ্ডুরাজার ঢিবি খনন কার্যের ফলে প্রায় সমসাময়িক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। যা থেকে ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাঙ্গালির ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) মন্তব্য করেছেন যে, "অন্তত ৩০০০ বৎসর বা তারও আগে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে এক সুসভ্য জাতি বাস করতো"। [৭] এ জাতীয়

প্রত্ন-নিদর্শনের সাথে বেলডাঙ্গার নিকটবর্তী 'মাড্ডা' গ্রামের খাল খনন কালে এক অতিকায় জন্তুর অস্থি আবিষ্কৃত হয়। পুরাতত্ত্ববিদের মতে, জলহস্তীর কঙ্কাল। এবং এর অনুঃ বয়স বলা হয়েছে ২০ হাজার বছরের। অনেকে আবার 'আমাড্ডা' অর্থে জলহস্তী এবং 'আম আড্ডা' কালক্রমে 'মাড্ডা' শব্দ রূপ লাভ করেছে বলে মনে করেন।

অন্যদিকে মুর্শিদাবাদে প্রাপ্ত অন্যতম প্রাচীন প্রত্ন-নিদর্শন পাওয়া গেছে সাগরদিঘী হাটপাড়া অঞ্চল থেকে। যে খানে ব্যবহৃত পাথরের ধরন থেকে তা রাজমহল পাহাড় থেকে নদী পথে নিয়ে আসা হয়েছিল বলে প্রত্ন-গবেষক গন মনে করেন। তাছাড়া প্রাপ্ত সামুদ্রিক কাটার উপচিহ্নিত রাজমহল পাহাড় থেকে সমুদ্র ক্রমশ দক্ষিণে সরে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। অন্য দিকে প্রাপ্ত পাথরের অস্ত্র ও হাতির দাঁতের নিদর্শন থেকে পরবর্তী পুরাতাত্ত্বিক গবেষক মহল এর বয়স ও অনুঃ ২০০, ০০০-২৫, ০০০ নির্ণয় করেছেন। [৮]

এ জাতীয় নিদর্শনাদির মধ্যে মৌর্য যুগ তৎপরবর্তী সময়ের পাওয়া কয়েন বা মুদ্রা গুলি যেমন রয়ছে তেমনি বেশকিছু সাহিত্যগত উপাদানও এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস নির্মাণে সাহায্য করে। তবে তা অবশ্যই লিপির আবিষ্কারের পরবর্তী এবং অবশ্যই হরপ্পা লিপির পরবর্তী যা এক কথায় খ্রীঃ পূঃ ১০০০ বা বেদ পরবর্তী কালের।

জৈন গ্রন্থ 'আচারন সূত্র' থেকে জানা যায় যে, জৈন ধর্মের ২৮ তম তীর্থঙ্কর মহাবীর(৫৪০-৪৬৮ খ্রীঃ পূঃ) মুর্শিদাবাদ জেলায় এসেছিলেন। বস্ত্রহীন(দিগম্বর পন্থী) জৈন সন্ন্যাসী কে দেখে এখান কার মানুষ তার পিছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়। "ছুঁ" বলে কুকুর লেলিয়ে দেয়ার শব্দ এখনও ব্যাবহার হয়। "ছুঁ" শব্দ টি অস্ট্রিক শব্দ থেকেই এই অঞ্চলে অস্ট্রিক সম্প্রদায়ের বসবাসের একটি উদাহরণ বলে মনে করা হয়। এখন এই শব্দ পরবর্তী কালে ঐ সম্প্রদায়ের দ্বারাই প্রচলিত ছিল নাকি এখান কার অন্য অধিবাসীরা তাদের থেকে শিখে ব্যবহার করতো বলা কঠিন। আচারঙ্গ সূত্র-এ মহাবীরের যে যাত্রা পথ বর্ণিত হয়েছে তাতে তিনি যে কজঙ্গল পরিক্রমণ করেন তা বোঝা যায়। এমন কি বর্ধমান-মানভূম প্রভৃতি শব্দ গুলির সাথে জেন তীর্থঙ্করের নাম থেকেই এসেছে এমন ধারনাও করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে হিউয়েন সাঙের গ্রন্থের বর্ণনা অনুসারে গৌতম বুদ্ধও এ অঞ্চলে ধর্মপ্রচারে এসেছিলেন। বর্তমান কর্ণসুবর্ণ কে তিনি 'সুবর্নকুড্য' বলে উল্লেখ করেছেন। যেখানে তিনি রক্ষমৃত্তিকা মহাবিহার অর্থাৎ একটি বিশ্ব বিদ্যালয় এর কথা বলেছেন। অনেকে 'পাঁচথুপি' নাম করনের সাথে 'পঞ্চস্তূপ' এর কথা বলে থাকেন। পাঁচথুপি "বারশেনা দেউল"কে গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক ধর্ম প্রচারের স্থল বলে মনে করা হয়। পরবর্তী কালে সম্রাট অশোক এই স্তূপ নির্মাণ করেন বলেও মনে করা হয়। অন্যদিকে বানভট্টের 'হর্ষচরিত'-এও কর্ণসুবর্ণের বর্ণনা রয়েছে।

তবে এখানে মনে রাখা জরুরী যে হিউয়েন সাঙের বর্ণনার উপর মূলত নির্ভর করেই কর্ণসুবর্ণের স্থান নির্দেশিত হয়েছে.১৮৯৩ সালের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে এইচ বেভারিজ প্রথম একথা বলেন। যদিও তাম্রলিপ্ত থেকে ১.৫ মাইল উত্তর-পশ্চিমে এই নগরীর অবস্থান বলে হিউয়েন সাং উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উত্তর-পূর্ব স্থলেই তাঁর উল্লিখিত 'কী-লো-না-সু-ফা-লানা' বা কর্ণসুবর্ণের অবস্থান। যে কারণে এই ভ্রমণ বৃত্তান্তের অনুবাদক ওয়াটার্স বলেছেন যে ভুল বশত তা উত্তর-পশ্চিম হয়েছে আসলে তা হবে উত্তর-পূর্বে। কেননা স্থানের শস্য সহ অন্যান্য বর্ণনা এই স্থানের সাথেই মিলে যায়। একথাও ঠিক যে গৌতম বুদ্ধ আদৌ এখানে বা বঙ্গদেশে এসেছিলেন কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিশিষ্ট গবেষক বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন যে, কৌটিলীয় আর্য শাস্ত্রের 'কোষপ্রবেশ্য রত্ন পরীক্ষা" অধ্যায়ে উৎকৃষ্ট রেশমবস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্র হিসেবে পূর্ব দেশের এক 'সৌবর্ণ কৌড্যাকের' উল্লেখ রয়ছে। শ্রদ্ধেয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রের সুপ্রাচীন 'সৌবর্ণ কুড্যক'হল বর্তমানে রাঙ্গামাটি অঞ্চল এবং এই সুবর্ণ কুড্যকই সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণ নামে চিহ্নিত হতো।

মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্তে শ্রদ্ধেয় বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় আর বলেছেন যে, খ্রীঃ পূঃ আনুমানিক ৩০০ বৎসর পূর্বেই 'রাঙ্গামাটি'(সোনার বর্ণের মাটি কর্ণসুবর্ণ) মৌর্য সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল এবং এখানে উৎকৃষ্ট মানের রেশম বস্ত্র নির্মাণ হত।

অন্য দিকে মালয়ে আবিষ্কৃত একটি লিপিতে "মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তস্য রক্ষমৃত্তিকা বাস"পঙক্তি থেকে প্রত্নতাত্ত্বিকগনের ধারনা যে খ্রীঃ ৫ম শতকের এই লিপিও এ অঞ্চলের বাণিজ্যিক গুরুত্বকেই তুলে ধরে। [৯]

অন্যদিকে ১৯২৮ থেকে প্রত্নস্থল হিসেবে গুরুত্ব প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক রাক্ষসীডাঙ্গার খননকার্য এবং তারই উপর নির্ভর করে ১৯৬১-১৯৬২ এবং ১৯৬৪ সালের খনন কার্যে প্রাচীন লিপি সহ শতাধীক শীল, বিভিন্ন ধরনের চুনাপাথর ও পোড়ামাটির মূর্তি এবং মৃৎপাত্র গুলির প্রত্নতাত্ত্বিক পরীক্ষণ খ্রীঃ সপ্তম শতকে এখানে কর্ণসুবর্ণ নগরীর উপস্থিতিই প্রমাণ করে। আবার গুপ্ত পরবর্তী কালের ইতিহাসের নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে বর্তমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে। সাগরদিঘী, শেখদিঘী, খেঁড়ুর মসজিদ, চন্দনমাটি, গড়ের মাঠ, সাহাপুর সহ সাগরদিঘী ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তে।

অন্যদিকে আদি-মধ্যযুগ পরবর্তী সময়ের বিভিন্ন সৌধ ও আজ জেলায় বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমাদের উদ্দেশ্য প্রাচীন মুর্শিদাবাদের একটি চলচিত্র নির্মাণ।

রাঢ় ও বরেন্দ্রী: মহাভারতের আদিপর্বে রয়েছে বৃহস্পতির অভিশাপে উচথ্য মুনির ঔরসে তার স্ত্রী মমতার গর্ভে এক অন্ধ পুত্রের জন্ম হয়। বেদজ্ঞ এই অন্ধ ঋষি ঋকবেদের কয়েকটি সূত্রের উদগাতা দীর্ঘতমা বলে পরিচিত। দীর্ঘতমা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও গো-ধর্ম শিক্ষা ও যত্র তত্র গো-ধর্ম রক্ষা করতে থাকায় তার প্রতিবেশী মুনিগণ তার প্রতি ক্রুদ্ধ হন। ফলে স্ত্রী প্রদ্বেষী ও তাঁর সন্তানদের দ্বারা দীর্ঘতমা পরিত্যক্ত হন। স্ত্রী প্রদ্বেষীর নির্দেশে তার সন্তানরা তাকে ভেলায় করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেন। ভাসমান সেই ভেলা বলিরাজার দেশে আসে। অপুত্রক বলিরাজা তখন গঙ্গায় স্নান করছিলেন। তেজস্বী দীর্ঘতমা ঋষিকে দেখে তার দ্বারা সন্তান উৎপাদনের জন্য তাকে স্বগৃহে নিয়ে যান। এই বেদজ্ঞ ঋষি দীর্ঘতমার ঔরসে বলিরাজের স্ত্রী সুদেষ্ণার গর্ভে-অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুম্ম নামে পাঁচটি তেজস্বী ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম হয় এবং তাদের দ্বারা শাসিত পাঁচটি দেশ- অঙ্গ (উত্তর বিহার) মহাভারতের কর্ণের রাজ্য এবং (ষোড়শ মহাজন পদে অন্যতম), বঙ্গ (সমতট), কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), পুণ্ড্র (বর্তমান উত্তর বঙ্গ) এবং সুম্ম অর্থাৎ দক্ষিণ ও পশ্চিম বঙ্গ তাদের নামেই পরিচিত হয়। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এর মতে, "...প্রাচীন পুণ্ড্র, গউর, সম্ম-রাঢ়-তাম্রলিপ্ত-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল ইত্যাদি ভৌগোলিক রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া এক অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় ঐক্য সম্বন্ধে যখন আবদ্ধ হইল, বিভিন্ন স্বতন্ত্র নাম পরিহার করিয়া এক বঙ্গ বা বাঙ্গালা নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করিল"। [১০]

ভাগীরথী নদী এই জেলাকে মূল দুটি খণ্ডে বিভক্ত করেছে এর পূর্বতীর 'বাগড়ী'ও পশ্চিম তীর 'রাঢ়' নামে খ্যাত। এই পশ্চিম বা দক্ষিণ পশ্চিমের রাঢ় অঞ্চল অধিক প্রাচীন। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলা পার্শ্ববর্তী বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলা সহ বৃহৎ অঞ্চল নিয়ে রাঢ় ভূমি। এই রাঢ় ভূমি ছোটনাগপুর মালভূমি পূর্ব প্রান্তে রাজমহল শৈলমালার কঠিন ভূমি ক্রমশ নিচু হয়ে ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এই ভূমির পূর্ব প্রান্ত অর্থাৎ ভাগীরথীর তীর পর্যন্ত ভূভাগই রাঢ় নামে পরিচিত। রাঢ় ভূমির আবার দুটি ভাগ অজয় নদীর উত্তর ও দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চল। যেখানে এই জেলা উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত। এই উত্তর রাঢ় ভূমিতেই বীরভূম ও বর্ধমানের একটি অংশ জুড়ে রয়েছে। মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার অনুসারে "জেলার উত্তর প্রান্তে গুমানি, তারপর দক্ষিণে যথাক্রমে বাগমারী, বাঁশলোই, পাগলা, বাক্রনী দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, কপাই বা কুয়ে নদী গুলি রাজমহল পাহাড় কিংবা পশ্চিম রাঢ়ের উচ্চ ভূমিতে উৎপন্ন হয়ে ভাগীরথীতে মিশেছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন এই নদী গুলি ভাগীরথী অপেক্ষা প্রাচীন"।

এই প্রাচীনত্বের কারণে জনবসতিও প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। ঠিক কোন জাতি বা গোষ্ঠী প্রথম থেকেই এখানে ছিল তা একেবারে নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়। তবে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, "বাঙ্গালাদেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমূদয় আদিম জাটি দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আদিবাসী গনের বংশধর। ...এই সমূদয় জাতিই একটি বিশেষ মানব গোষ্ঠীর বংশধর। এই মানব গোষ্ঠীকে "অস্ট্রো

এশিয়াটিক" বা "অস্ট্রীক"এই সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, কিন্তু কেহ কেহ ইহাদিগকে "নিষাদ জাতি" এই আখ্যা দিয়েছেন"। [১১]

ডঃ মজুমদার আরও লিখেছেন যে, কেহ কেহ ইহাদিগকে আলপাইন জাতি বলেন এবং বলেন যে, ইহার নিষাদ জাতির অব্যবহিত পরেই বঙ্গদেশে বাস করিতে থাকেন। পণ্ডিতদের অধিকাংশ অনুমান করেন যে, এই জাতি খুবই উচ্চ সভ্যতার অধিকারী ছিলেন আর্য গন বঙ্গদেশে বসবাস করিবার পূর্বে এখানে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় তাহার কৃতিত্ব প্রধানত আলপাইন জাতিরই প্রাপ্য।

এক্ষেত্রে ডঃ মজুমদার ফারাক্কা ফিডার ক্যানেলের খনন কালে প্রাপ্ত প্রত্ন-নিদর্শন ও পান্ডুরাজার ঢিবিতে প্রাপ্ত প্রত্ন সামগ্রীর নিরিখে অনুঃ তিন হাজার বা তারও বেশি আগের সু-সভ্য এক জাতির বসবাসের কথাও বলেছেন। [১২]

রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর গৌড়ের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন যে, রাঢ় দেশ ও মধ্যবাঙ্গালার উত্তরাংশ কর্ম-বংশীয় গনের অধীন ছিল, ...মহাবীর ও বুদ্ধদেবের সময় ব্রহ্মাদত্ত বংদেশের রাজা ছিলেন। যাইহোক রাঢ়া বা রাঢ় শব্দটির উল্লেখ পাওয়া যায় জৈনদের অন্যতম প্রাচীন গ্রন্থ 'আচারঙ্গ সূত্রে'। যদিও মহাবীরের এখানে ধর্ম প্রচারে আসা এবং এক অসভ্য জাতি কর্তৃক উৎপীড়নের কথা এখানে বলা হয়েছে। অন্যদিকে স্থানের বর্ণনা ঠিক কোন অঞ্চলের কথা বলা হয়েছে, তা নির্ণয় করা কঠিন। কেন না প্রকৃতিগত পরিবর্তন ও এই স্থান নির্ণয়ে বাধার সৃষ্টি করে। তবে এই বর্ণনা অনুসারে পণ্ডিত মহল মনে করেন যে, এই গ্রন্থে উল্লিখিত রাঢ়ের দুটি ভাগ 'বজজ' বা বজ্রভূমি অথবা ব্রক্ষভূমি এবং 'সুবভ' বা সুম্মভূমি। চতুর্থ শতকে লিখিত পালি-গ্রন্থ দীপ-বংশ এবং পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত মহাবংশ-এ 'রাঢ়' দেশের উল্লেখ রয়েছে। এখানে পালরাজ মহীপালকে উত্তর রাঢ়, এবং কর্নশুর কে দক্ষিণ রাঢ় এর রাজা বলা হয়েছে। পাল পূর্ব যুগের বংশানুচরিত-গ্রন্থে ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র সরকার ৯৮১ সালে উৎকীর্ণ পরমার মুঙ্গেরী গাঁওরী শাসনে দক্ষিণ রাঢ় এবং ত্রয়োদশ শতকের মলকাপুর লেখতে গৌড়ের অন্তর্গত দক্ষিণ রাঢ় এর উল্লেখের কথা বলেছেন। [১৩]

এছাড়াও উত্তর রাঢ় অর্থাৎ বর্তমান মুর্শিদাবাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অনুঃ ৯ম শতকে উৎকীর্ণ গঙ্গারাজ দেবেন্দ্র বর্মণের একটি লিপিতে। তাছাড়া বল্লার সেনের নৈহাটি তাম্রশাসন এবং লক্ষণ সেনের শক্তিপুর তাম্রশাসনে উত্তর রাঢ় অঞ্চলের বিবরণ রয়েছে।

অন্যদিকে মহাভারতে এবং কালিদাসের রঘুবংশের সুম্ম-এর সঙ্গে বঙ্গ, পুণ্ড্র, অঙ্গ, নাম গুলি পাওয়া গেলেও রাঢ় এর উল্লেখ নেই। আবার গৌড়রাজ শশাঙ্কের সময় কর্ণসুবর্ণের কথা রয়েছে। তাছাড়া উত্তর রাঢ়ের কজঙ্গল এর উল্লেখ হিউয়েন সাঙ থেকে সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাছাড়া পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, বাৎস্যায়ন এর 'কামসূত্র' এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যেমন 'গৌড়'দেশের কথা আছে। তেমনি বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা'তে বর্ধমান, তাম্রলিপ্তর কথা গুলি রয়েছে। কাজেই এই সময়ে রাঢ় দেশ বৃহৎ গৌড় এর অন্তর্গত বলেই পণ্ডিত মহলের বিশ্বাস। কাজেই সপ্তম শতকের গৌড় সমগ্র আর্যাবর্তে খ্যাতিমান হয়ে ওঠে। সুতরাং গৌড় শুধু জনপদ বা বৃহৎ রাজ্যই নয়, গৌড়ীয় সংস্কৃতির প্রভাবে তার অন্তর্গত সমস্ত অঞ্চলই প্রভাবিত হয়। ফলে এই গৌড় জনপদ যা এই সময়ে প্রায় সমস্ত বাঙ্গালাদেশকেই বোঝাত তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। শশাঙ্কের রাজধানী হওয়ার সুবাদে কর্ণসুবর্ণ বা বর্তমান মুর্শিদাবাদে তার আশপাশের সমস্ত অঞ্চলই এই জেলার ইতিহাস বলে ধরা হয়ে থাকে। আসলে একই জনপদের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামকরণ রাজ্য সীমার বিস্তৃতি বা সংকোচন প্রাচীন ভারত ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোন অঞ্চলকে চিনে নিতে অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। তাই আজকের মুর্শিদাবাদ আলাদা করে বা একেবারে তার সীমানা ধরে ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়না। এই অঞ্চল যখন কোন অঞ্চলের মধ্যে থেকেছে তার থেকেই এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাসের ধারনা লাভ করা সম্ভব। বাঙ্গালির ইতিহাস (আদিপর্ব)-এ ঐতিহাসিক নীহার

রঞ্জন রায় লিখেছেন যে, "অকাট্য লিপি প্রমাণ এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থে গঙ্গা ভাগীরথীই রাঢ়ের উত্তর সীমা এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকতে পারে না"।[১৪]

বাগড়ি: বর্তমান ভাগীরথীর পূর্ব তীর মূলত বাগড়ি নামে পরিচিত। তবে এই অঞ্চল রাঢ় এর মতো এত পুরাতন নয়। নিচু জমি অসংখ্য খাল-বিল এবং জলাভূমি অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রথমে মৎস্যজীবী ও কৃষিজীবী মানুষের বসতি গড়ে ওঠে। তবে বর্তমানে মুর্শিদাবাদের বাগড়ি আয়তন জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুসারে নদীয়া থেকে যশোহর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভাগীরথীর কারণে রাঢ় অঞ্চলের সাথে এর তেমন নৈকট্য না থাকলেও পুণ্ড্র এর সাথে এর যোগাযোগ ছিল। এমনকি সাদৃশ্যের দিক থেকে বিচার করলে বর্তমান বাঙ্গালাদেশের রাজশাহী এবং সন্নিহিত অঞ্চলের সাথেই এর যোগাযোগের আভাস মেলে। অনেকেই মনে করেন যে, যখন পদ্মা নদীর অস্তিত্ব ছিলনা তখন মহানন্দাই এখান কার মূল নদী ছিল। পরে পদ্মার কারণে মহানন্দা বিভক্ত হয়ে ভৈরব নদীর জন্ম দেয়। (এখনও পর্যন্ত ১০০০ বৎসরের পূর্বে পদ্মার অস্তিত্বের কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি)। কাজেই এই অঞ্চল যে উত্তর বঙ্গের সাথে যুক্ত ছিল তা বলা যেতেই পারে। তবে এ কথাও ঠিক যে, এই অঞ্চল বঙ্গ জাতীর অধীনে ছিল। অষ্টম শতকে ধর্মপালের খালিমপুর লিপি ব্যাঘ্রতটি মণ্ডলের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, এই 'ব্যাঘ্রতটি' শব্দটির থেকেই 'বাগড়ি' শব্দের সৃষ্টি। বাঘের বাসভূমি যা নদী বা সমুদ্র তটবর্তী-থেকেই ব্যাঘ্রতটী এই কথাও মনে করা হয়। প্রাকৃত ভাষায় যা দাড়ায় 'বগঘঅড়ী' এবং এ থেকেই 'বাগড়ী'। ওয়াটার সাহেব যে ভাবে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ বৃত্তান্তের অনুবাদ করেছেন তা থেকে বলা হয় যে, ভাগীরথীর পূর্বে পদ্মার দক্ষিণে এখন যে বাগড়ি নামে জনপদ আছে তাই আসলে ব্যাঘ্রতটী এবং যখন পদ্মার সৃষ্টি হয়নি তখন এই অঞ্চল আদি পন্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

খুব সম্ভবত সেন আমলে বাগড়ি অঞ্চল একটি স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চলে পরিণত হয়। কাজেই সময়ের ব্যবধান এর আলাদা পরিচয় দিলেও, মূলত বঙ্গ এবং পুণ্ড্র উভয় অঞ্চলের ইতিহাসের সাথে এই অঞ্চলের ইতিহাস দাঁড়িয়ে রয়েছে বলা যায়।

আমরা দীর্ঘতমা ঋষির ঔরষে রানী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচ ক্ষেত্রজ সন্তানের জন্মের কাহিনীর উল্লেখ করেছি তার সম্পর্কেও কিছু কথা বলা জরুরী। কারণ মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সাথে যোগ ছিল। যে কারণে আজকের রাঢ় এবং বাগড়ি ছাড়াও কর্ণসুবর্ণ ক-জঙ্গল গৌড় প্রভৃতি বিস্তৃত রাজ্যের সাথেও এর ইতিহাস ছড়িয়ে রয়েছে। বদল হয়েছে রাজ্যসীমার, বদল হয়েছে নামকরণে, ফলে এই অঞ্চল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভূমির সাথে যুক্ত ছিল। বর্তমানে মুর্শিদাবাদের সীমানা ছড়িয়ে তার সীমা বিস্তৃত হয়েছে পরাক্রমশালী রাজাদের দ্বারা। অন্য দিকে একি অঞ্চলের বিভিন্ন সময়ে নাম বদলে যাওয়ার কারণেও অনেক সময় বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও করে। যেমন রাঢ় জনপদের দক্ষিণাংশ সুম্ম নামে খ্যাত ছিল। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে সুম্মদেশ জয় করার কথা রয়েছে। ঐতিহাসিক নীহার রঞ্জন রায় লিখেছেন যে, প্রাচীন কাল থেকেই সুম্মা একটি পরিচিত দেশ ছিল। অন্যদিকে বঙ্গ এবং পন্ড্র ও আর্যদের নিকট পরিচিত ছিল কিন্তু ব্রহ্মা বা রাঢ়ের পরিচিতি ছিল না। এ দেশের পৃথক অস্তিত্ব ছিল কিনা সন্দেহ। অনেকে মনে করেন যে, এটি হয় তো অঙ্গ দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১৫]

কজঙ্গল: এই জেলার একটি প্রাচীন নাম 'কজঙ্গল' ইতি পূর্বে প্রত্ন-নিদর্শন প্রসঙ্গে আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করেছি। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় তাঁর উল্লেখ রয়েছে। History Culture of the Indian people গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে-যে, হর্ষবর্ধন কঙ্গোদ জয়ের পর ৬৪৩ খ্রীঃ এখানে বন কাটিয়ে সামরিক শিবির স্থাপন করে অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁর রাজ সভার অধিবেশন বসিয়েছিলেন। তাছাড়া বৌদ্ধ গ্রন্থ গুলির পাশাপাশি, সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'গ্রন্থেও কঙ্গলের রাজা নরসিংহার্জুন এর নাম রয়েছে। তবে এ কথাও ঠিক যে, এক সময় এই অঞ্চলও গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার স্বাধীন অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে।

গৌড়: অন্যদিকে 'গৌড়'রাজ্য এবং এই শব্দের উৎপত্তি বিষয়ে গবেষক গন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সাধারণ ভাবে 'গুর' থেকে এই শব্দ এসেছে বলেই মনে করা হয়। তবে ঋকবেদেও এই শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। যে অন্ধ ঋষি দীর্ঘতমার ঔরষে অঙ্গ, বঙ্গ, পদ্ড্র, কলিঙ্গ, সুম্মার সৃষ্টি এবং যাদের নামানুসারে স্থানের নামকরণ-সেই দীর্ঘতমতা ঋষি প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সংখ্যক যুক্তের উদ্গোতা। ঋকবেদের ১/১৬৪ এর ১৭ সংখ্যক ঋক বা মন্ত্রে গৌরূদস্থাৎ; ২৮ সংখ্যক ঋক এ গৌর মীমেদনু; ২৯ সংখ্যক ঋক এ "গৌরীভাবৃতা" এবং ৪১ সংখ্যক ঋক বা মন্ত্রে 'গৌরী মির্মায়' শব্দ গুলি রয়েছে। এখন এই গৌর শব্দের অর্থ বঙ্গীয় শব্দকোষে বলা হয়েছে, গৌর বর্ণযুক্ত। [১৬]

পীত, হরিদ্রাবর্ন, শ্বেত, ধবল, অরুন, লোহিত, উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ, 'অমরকোষ' বা 'অমরচন্দ্রিকায়' 'গৌর'-অর্থে অরুণ শুক্ল ও পীত। ত্রি.ঋকে বলা হয়েছে শর্ব্বয্যাং-ভবমন;অন্ধতমসে গড়ান্ধকারে;যায়ুকো হনন শীল; ভেদ্যলিঙ্গকমিতি রান্তং বাবদিতি স্বামী। অরুনে রক্তে-অমরার্থ চন্দ্রিকা-পৃঃ-৩৭৫। বিশিষ্ট গবেষক ডঃ দেবব্রত মালাকারের মতে-গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে যে আলোর প্রকাশ তাকেই গৌর বলা হয়। [১৭]

আসলে গৌড় রাজ্য শশাঙ্কের সময়ে বঙ্গ দেশে ছড়িয়ে যে ভাবে বিস্তৃত হয়। তাতে উত্তর ভারত পর্যন্ত এর সীমা চলে যায়। এর পর পাল ও সেন আমলে বাঙ্গালার গৌরব সমগ্র ভারত ভূখণ্ডে অক্ষুণ্ণ ছিল। কাজেই শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ জেলাই নয় পার্শ্ববর্তী জেলা গুলির সীমা ছাড়িয়ে 'গৌড়' একটি সংস্কৃতি হিসেবে উঠে আসে। পরবর্তী কালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নামকরণ ও বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও এই নামের খ্যাতি আলাদা ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। 'গৌড়ীয় মঠ' থেকে গৌড়ীয় নৃত্যের বিশিষ্ট তথা প্রধান গবেষক ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়-এর হাত ধরে তা পূর্নজাগরনের রূপ লাভ করে। অন্যদিকে শশাঙ্কের সময় কর্ণসুবর্ণ রাজধানী হওয়ার সুবাদে মুর্শিদাবাদ অঞ্চল যেমন আলাদা গুরুত্ব লাভ করে তেমনি পাল ও সেন আমলেও আবার তা বজায় ছিল। আবার মধ্যযুগেও বাঙ্গালা দেশ যে ভাবে গুরুত্ব লাভে করেছিল তারই সূত্র ধরে সুজলা-সুফলা বাংলার প্রধান প্রশাসনিক কার্যালয় ইংরেজ আমলের সূচনা পর্যন্ত অটুট ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ভাবে অধিক গুরুত্ব লাভকারী এই অঞ্চলের খ্যাতি পূর্বকালেও ছিল। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকের পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী', খ্রীঃ পূঃ চতুর্থ শতকের কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'; এমন কি খ্রীঃ তৃতীয়-চতুর্থ শতকের বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র'- সহ পরবর্তী কালের বহু গ্রন্থেই গৌড় দেশের উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল যে, যে সময়ে হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবর্ণ আসেন তখন তিনি আলাদা করে গৌড় দেশের কথা লেখেন নি। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর সম্ভবত গৌড়ের খ্যাতি কিছু কাল ম্রিয়মাণ হয়ে যায়। তাই তিনি ক-জঙ্গল, পদ্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্ত এবং কর্ণসুবর্ণ এই পাঁচ নামের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শশাঙ্কের রাজ্য সীমা যেখানে বারানসী থেকে উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃতি সেখানে উক্ত স্থান গুলি যে, গৌড়ের অধীনে ছিল তা বলাই বাহুল্য। মৌখরি বংশীয় ইশান বর্মণের "হড়হ" শিলালিপি যা খ্রীঃ ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে উৎকীর্ণ সেখানেও গৌড় দেশের বিস্তৃতি সমুদ্র পর্যন্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা অনুসারে ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, খুব সম্ভবত মুর্শিদাবাদ জেলাঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র বিভাগ প্রথমে গৌড় বিষয় নামে পরিচিতি হলেও পরে এই নাম থেকেই গৌড় দেশ নামের উৎপত্তি।[১৮]

ডঃ নীহার রঞ্জন রায় এর মতে, দক্ষিণ মালদা, উত্তর বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে মূল গৌড় দেশের অবস্থান অনুমান করা যায়।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার আর একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে, "মুসলমান যুগের প্রারম্ভে মালদহ জেলার লক্ষণাবতী গৌড় নামে অভিহিত হইত। পাল... পাল রাজধানী রামাবতী ও ইহার নিকটেই ছিল"। [১৯]

এখানে একটি কথা মনে রাখা জরুরী যে, অনেক সময় একটি স্থান বিভিন্ন রাজার আমলে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। যে, কারণে রামাবতী, বিজয়পুর, লক্ষ্মনাবতী এগুলি সবই মোটামুটি ভাবে একই স্থানের নাম।

[দ্রঃ ২০১২ সালে আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রে "The Disguised Identity of Ramabaty, Bijoypure and Laxmanaboty…যাইহোক ডঃ মজুমদার লিখেছেন যে, "হিন্দু যুগের শেষ আমলে বাংলাদেশ, গৌড় ও বঙ্গ-প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ় ও বরেন্দ্রী গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল"। [২০]

বঙ্গ: ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, "এই প্রাচীন জনপদ বর্তমান কালের দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ লইয়া গঠিত ছিল। সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র ইহার সীমা রেখা ছিল"।

তিনি আরও লিখেছেন যে, সম্ভবত তখন বর্তমান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪পরগনা, যশোহর, পাবনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং রাজশাহী জেলার কিয়দংশ বঙ্গদেশের অন্তর্গত ছিল। [২১] ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ সম্পর্ক এর উল্লেখ আছে। এখানে বলা হয়েছ- ইমাঃ প্রজাস্তিস্রা অত্যায়ামায় স্তানীমানি বয়াংসি। বঙ্গাবগভধাশ্চেব পাদান্যন্যা অর্কমতো বিবিস্র ইতি যথা।।

যদিও গৌড়ের ইতিহাসে রজনীকান্ত চক্রবর্তী লিখেছেন, যে পুণ্ড্র, সুম্ম, উপবঙ্গ, রাঢ় প্রভৃতি সমুদয় দেশই এখন বঙ্গদেশের অন্তর্গত হয়েছে। কিন্তু পূর্ব কালে বঙ্গদেশ কেবল ঢাকা অঞ্চলকে বুঝাইত। [২২]

মহাভারতের সভা-পর্বে (২৯ তম অধ্যায়ে বঙ্গ, পুণ্ড্র, সুক্ষ ও তাম্রলিপ্তের পৃথক রাজার উল্লেখ আছে), অন্যদিকে রঘুবংশের চতুর্থ সর্গ অনুসারে সুক্ষ ও বঙ্গের আলাদা অস্তিত্বের উল্লেখ রয়েছে। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার এর মতে, "বল্লাল সেনের সময় (দ্বাদশ শতাব্দী) বর্তমান বঙ্গদেশ, রাঢ়, বরেন্দ্রী, বাগড়ী ও বঙ্গ-এই চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। বাগড়ী সম্ভবত বর্তমানকালের মেদিনীপুর জেলা ও পার্শ্বস্থিত জনপদ লইয়া গঠিত হইয়াছিল। দুইশত বৎসর পূর্বেকার দলিলেও গড়বেতা অঞ্চল বাগড়ী নামে উল্লেখিত হইয়াছে। রাঢ় (পশ্চিমবঙ্গ) ও বরেন্দ্রী (উত্তরবঙ্গ) এই চারটি এখনও সুপরিচিত নাম। সম্ভবত তখন বর্তমান মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, ২৪ পরগনা, যশোহর, পাবনা, বরিশাল, ফরিদপুর এবং রাজশাহী জেলার কিয়দংশ বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই প্রাচীন জনপদ বর্তমান কালের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া গঠিত ছিল। সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র ইহার সীমারেখা ছিল। [২৩]

রামায়ণের অযোধ্যা-কান্ডের ১০ম অধ্যায়ে বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। যেমন রয়েছে রঘু-সংহিতায়, যেখানে লেখা হয়েছে-

"অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র মগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।।"

আসলে এখানে আর্যায়নের পূর্বে আদিবাসী মানুষের বসবাস ছিল। এই আদিবাসী সম্প্রদায়ের দেশে এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো এমন কথা বৌধায়ন ও লিখেছেন। যাইহোক দিল্লীর মেহেরাগুলির লৌহস্তম্ভে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক বঙ্গীয়দের পরাজয়ের কথা আছে। জৈনধর্ম গ্রন্থ আচারঙ্গসূত্র অনুসারে মহাবীর রাঢ় দেশে ধর্ম প্রচারে এলে এখানকার লোকেরা তার সাথে দুর্ব্যবহার করেছিল বলে উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু বুদ্ধদেবের ধর্ম প্রচার সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ যে কর্ণসুবর্ণর(মুর্শিদাবাদের রাঢ় ও বাগড়ী) উল্লেখ করেছেন। তার প্রমাণ কোন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে পাওয়া যায়না। বুদ্ধদেবের মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণের আসা প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ গেজেটিয়ার - ২০০৩ এ বলা হয়েছে "কর্ণসুবর্ণ উৎখনন খ্যাত অধ্যাপক সুধীর দাস মনে করেন, বুদ্ধদেবের কর্ণসুবর্ণে ধর্ম প্রচারের কথা য়ুয়ান চোয়াং স্থানীয় কিংবদন্তী থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। [২৪]

'বঙ্গ' দেশের নাম কিন্তু হিউয়েন সাঙ করেননি। তিনি একে সমতট বলেছেন। যদিও বরাহ মিহিরের কুর্ম্মবিভাগ গ্রন্থে অবশ্য বঙ্গ, সমতট এবং উপবঙ্গকে আলাদা দেশ ধরা হয়েছে। [২৫]

তবকৎ-ই-নাসিরী গ্রন্থে সমতট কে সনকট বা সাঁকট বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বঙ্গ শব্দ কবে থেকে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা হয়েছে তা বলা কঠিন। অনেকে মনে করেন বন্যা প্রবণ (ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা) এলাকাকে বাঁচানোর জন্য বাঁধ বা 'আল' দেওয়া হত। তা থেকেই সম্ভবত 'বঙ্গ+আল' থেকে বঙ্গাল বা বাঙ্গালা নামের উৎপত্তি। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালায় শিলালিপিতে বঙ্গাল শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং ইসলামীয় শাসনের পূর্ব থেকেই এই নাম প্রচলিত ছিল। জেলার বাগড়ী অঞ্চল সম্ভবত এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদিও রমেশ চন্দ্র মজুমদারের মতে, বঙ্গ পূর্বে পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্রাংশের নাম ছিল। বঙ্গ ও বাঙ্গালা দুই নামই এক সময় পৃথক দেশের নাম ছিল। [২৬]

কর্ণসুবর্ণ ছিল শশাঙ্কের রাজধানী যা বহরমপুর থেকে মাত্র ৬ মাইল দক্ষিণে(চিরুটি) কর্ণসুবর্ণ একটি রেল স্টেশন এর নিকটবর্তী রাঙ্গামাটি ছিল বলে উৎখননের পর প্রমাণিত হয়েছে। হিউয়েন সাঙ সপ্তম শতকে (৬৩৭/৩৮) এখানে আসেন। তার বিবরণে কর্ণসুবর্ণের নাম রয়েছে। ইতিহাসে গৌড়ের রাজধানী হিসেবে কর্ণসুবর্ণের নাম প্রসিদ্ধ। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখেছেন যে, রাজবাড়ি ভাঙ্গাই যে প্রাচীন রক্তমৃত্তিকা বিহারের ধ্বংসাবশেষ এবং কর্ণসুবর্ণ নগর যে ইহার সন্নিকটে অবস্থিত ছিল ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে। এই অঞ্চল অবহিত 'রাঙ্গামাটি' গ্রাম এখনও 'রক্ষমৃত্তিকা' নামের স্মৃতি বহন করিতেছে। [২৭]

ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকারের মতে, আদি মধ্য যুগে দেখা যায় বাংলা বিহার, কামরূপ, (আসাম), উড়িষ্যা, বাংলা দেশে একই সাংস্কৃতিক অঞ্চলের মধ্যে ধরা হত। ষষ্ঠ শতকে গৌড় রাজ্যের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ যে সংস্কৃত রচনারীতি জনপ্রিয়তা লাভ করে ৭ম, ৮ম শতকে দণ্ডীর কাব্যাদর্শ রচিত হওয়ার সময় সেই রীতিটি প্রাচ্য বা পূর্ব ভারতীয় রীতি বলে পরিচিতি হয়। [২৮]

বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার যে আয়তন তার মধ্যে কর্ণসুবর্ণই সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন বলা চলে। প্রত্ন সামগ্রীয় ইতিহাস আরও প্রাচীন। তবে ঠিক কোন সময়ে এই অঞ্চল কোন নামের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা বলা কঠিন। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্কের সময়ের বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং এর পূর্বে এই অঞ্চল কোন বিভাগের সাথে যুক্ত ছিল আর কোন নামের এলাকা কত বিস্তৃত ছিল বা এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন নামের মধ্যে কোন নামের সাথে এর যোগ ছিল তা একে বারে সন তারিখে বলা কঠিন। তবে রাঢ় বা সুম্ম যা ছিল ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত যাকে আবার অজয় নদী উত্তর ও দক্ষিণ দু-ভাগে ভাগ করে তা মুর্শিদাবাদকে নিয়েই। আবার বরেন্দ্র বা পুন্ড্র রাজ্য এক সময় বর্তমান বাংলাদেশের, প্রায় সমস্ত অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। কাজেই মুর্শিদাবাদের কিয়দংশ বা সমগ্র অঞ্চল কোন সময়ে এর অন্তর্ভুক্ত থাকার সম্ভাবনাও আছে। অন্যদিকে বাগড়ী অঞ্চল অর্থাৎ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ অঞ্চল যা এক সময় সমতট বলে খ্যাত ছিল, তার অংশ বিশেষ মুর্শিদাবাদ কে নিয়ে গঠিত থাকতে পারে। সমতটের সুন্দরবন কে বলা হত উপবঙ্গ। অন্যদিকে গৌড় রাজ্যের বিস্তৃতির সময় যে, এই অঞ্চল সমগ্র গৌড় বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল তা নিয়ে কর্ণসুবর্ণের উৎখননের পর আর কোন সন্দেহ নেই। গৌড় রাজা শশাঙ্কের আমল তাই এই পূর্বে প্রাচীন পর্বের সবচেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিহাস নির্মাণের নির্দিষ্ট সময়। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক তথা সামাজিক ইতিহাস নানা সময়ে নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়। ফলে আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে কোন একটি জেলাঞ্চলের পুরাতন ইতিহাস নির্দিষ্ট করে বলা প্রায় অসম্ভব। গৌড়ের ইতিহাসে সেন ও পাল আমল তথা শশাঙ্কের আমল থেকেই বলা যায় যে, এই জেলার গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। যদিও কৃষি প্রধান উর্বর এই জেলা তে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য প্রাচীন ইতিহাসের গুরুত্ব থাকা খুব স্বাভাবিক। প্রমাণ তাই বদলে দেয় ইতিহাসের পুরাতন ধারনা এই হল চলমানতার মধ্য দিয়ে নতুন করে পাওয়ার ঐতিহাসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে মধ্যকালীন ভারতে এবং আধুনিক যুগে এই অঞ্চলের অসীম গুরুত্ব যে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক রাজনীতির জন্ম দিয়েছিল তা ভারতের ইতিহাসের অন্যতম অধ্যায়। নবাবী আমলের গোঁড়া পত্তনের কিংবা লক্ষণ সেন পরবর্তী সময় মুসলিম বিজয় বঙ্গদেশের ইতিহাসে অর্থনৈতিক গুরুত্ব কে আলাদা করে আলোচনার অবকাশের সৃষ্টি করে। আবার

ভৌগোলিক পট পরিবর্তন কিভাবে বাণিজ্য ও কুটির শিল্প প্রধান এই জেলাকে ক্রমশ: কৃষি নির্ভর করে তুলেছিল সেই ঐতিহাসিক আকর্ষণও আজ গবেষকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সন্দেহ নেই।

তথ্যসূত্র:

১. ড. রায় নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, অগ্রহায়ন, ১৪১০, পৃ. ৭৮-৭৯।

২. বন্দোপাধ্যায় বিজয়, *মুর্শিদাবাদ জেলার পুরাতত্ব সম্পদ*, সম্পাঃ. অরুপ চন্দ্র, মুর্শিদাবাদ জেলার ইতিবৃত্ত, বাসভূমি, বহরমপুর, ২০০৮, পৃ. ৯।

৩. ড. মজুমদার রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, জেনারেল পিন্টার এন্ড পাবলিশার্স, ৯ম সংস্করণ, কোলকাতা-১৩, পৃ. ২১।

৪.বন্দোপাধ্যায় বিজয়, *প্রাচীন মুর্শিদাবাদ: গৌড়বঙ্গের রাজ্যসীমা ও বর্তমান মুর্শিদাবাদ*, সম্পাঃ. অরূপ চন্দ্র, বাসভূমি, প্রথম পর্ব, অতি প্রাচীন পর্ব, বহরমপুর, ২০১৫, পৃ. ৩৫।

৫. ড. রায় নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদিপর্ব*, তদেব, ৭৮-৭৯।

৬. *মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার*, প.ব, জেলা গেজেটিয়ার, উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, প.ব সরকার এবং জেলাশাসক ও সমাহর্তা, মুর্শিদাবাদ, সম্পাঃ. বিজয় বন্ধোপাধ্যায়, সেনগুপ্ত সৌমিত্র শঙ্কর ও বিশ্বাস প্রকাশ দাস, নভেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৭০-৭১।

৭. ড. মজুমদার রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন যুগ*, তদেব, পৃ. ১৩।

৮. তদেব, পৃ. ১০।

৯. বন্দোপাধ্যায় বিজয়, *মুর্শিদাবাদ জেলার পুরাতত্ব সম্পদ*, তদেব, পৃ. ১১।

১০. ড. রায় নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, তদেব, পৃ. ১১।

১১. ড. মজুমদার রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তদেব, পৃ. ১০।

১২. তদেব, পৃ. ১৩।

১৩. ড.সরকার দীনেশচন্দ্র, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত*, সাহিত্যলোক, কোলকাতা-৬, ২০১৫, পৃ. ৪৩।

১৪. ড. রায় নীহাররঞ্জন, *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব*, তদেব, পৃ. ১১।

১৫. তদেব, পৃ. ১৪৬।

১৬. বন্দোপাধ্যায় হরিচরন *বঙ্গীয় শব্দকোষ*, সাহিত্য অ্যাকাডেমি, ২০০৩, পৃ. ১২৮।

১৭. ড. মালাকার দেবব্রত, *বেদের উদ্ভব-স্থল ও গৌড় বরেন্দ্রভূমি*, অমরভারতী, কোলকাতা-৯, ২০১১, পৃ. ১৯৫।

১৮. ড. মজুমদার রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তদেব, পৃ. ৯।

১৯. তদেব, পৃ. ১০।

২০. তদেব, পৃ. ১০।

২১. তদেব, পৃ. ১০।

২২. চক্রবর্তী রজনীকান্ত*গৌড়ের ইতিহাস*, সম্পাঃ. মলয় শঙ্কর ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা-৭৩, পৃ. ৩২।

২৩. ড.মজুমদার রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তদেব, পৃ. ৯।
২৪. *মুর্শিদাবাদ জেলা গেজেটিয়ার*, তদেব, পৃ. ৭৩।
২৫. চক্রবর্তী রজনীকান্ত, *গৌড়ের ইতিহাস*, তদেব, পৃ. ৩৪।
২৬. ড. মজুমদার রমেশচন্দ্র, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, তদেব, পৃ. ১১।
২৭. তদেব, পৃ. ১০।
২৮. ড. সরকার দীনেশচন্দ্র, *পাল-পূর্ব যুগের বংশানুচরিত*, তদেব, পৃ. ১৫৫।